বাতায়ন

ডাকি লয়ে যাও মুক্ত দ্বারে

সুমিতা চৌধুরী

সালটি ছিল ২০০৮। স্কুলের একটি কাজে পূর্ব মেদিনীপুরের প্রত্যন্ত গ্রামের সমষ্টি উন্নয়ন অফিসে গিয়েছি। একটি দেওয়াল লিখনে চোখ আটকে গেল : ''মেয়ে হবে কন্যারত্ন/ দিলে শিক্ষা নিলে যত্ন।'' সব মেয়েকে শিক্ষার অঙ্গনে আনার জন্য আবেদন। এই একবিংশ শতকেও মেয়েদের সব্বাইকে লেখাপড়া শেখানোটা যে জরুরি এই বোধ জাগানোর জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালাতে হচ্ছে। সমাজের আনাচে-কানাচে আজও কত অনীহা জমাট অন্ধকারের মতো লুকিয়ে আছে।

মনে কিছু কিছু টুকরো ইতিহাস ফুটে উঠল। আজ থেকে কত কত বছর আগে নারীশিক্ষার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। এজন্য যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন সমাজে তাঁদেরকে কতই না কটু কথা, নিন্দা-মন্দ সহ্য করতে হয়েছিল।

সাল ১৮৪৯। কলকাতার কয়েকজন মহান মানুষ ব্যস্ত হয়ে খুঁজে চলেছেন মেয়েদের বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য একটি উপযুক্ত স্থান। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হল। স্থানাভাবের কারণে কিছুদিন পরেই গোলদিঘির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে নতুন একটি বাড়িতে সেই বিদ্যালয় স্থানান্তরিত হয়। এঁদের মধ্যে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন। তিনি বড়লাটের দরবারে ব্যবস্থাসচিব ছিলেন। তাঁর মনটি ছিল নারীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য সদাজাগ্রত ও উদ্‌বেলিত। উপযুক্ত কয়েকজন সাথিও জুটে গেল। বাবু রামগোপাল ঘোষ, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, মদনমোহন তর্কালংকার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং সবচেয়ে উৎসাহী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই স্কুলের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বিদ্যাসাগর মশাই মেয়েদের স্কুলের জন্য শরীর, মন, ধনসম্পদ সবই উৎসর্গ করতে উন্মুখ ছিলেন।

স্কুল তো হল, কিন্তু মেয়ে দেবেন কারা? বেথুন সাহেব হার মানার পাত্র নন। সরল অমায়িক মানুষটি বেতন পেতেন অনেক টাকা, তার সবটাই স্কুল চালানোর জন্য ব্যয় করতে তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। বাড়ি বাড়ি পৌঁছে গেলেন। অবশেষে মদনমোহন তর্কালংকারের দুই কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে কোলে করে স্কুলে নিয়ে এলেন। বালিকাদের সঙ্গে খেলা করেন, কৌতুক করেন। এভাবে তাদের মন জয় করে পড়াশোনায় আগ্রহ সৃষ্টির জন্য সর্বদা চেষ্টা করেন। কন্যাদেরকে স্কুলে ভর্তি করার ফলে তর্কালংকার মশাইকে অশেষ কষ্ট

ও সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছিল। ১৮৫১ সালে স্কুলটি ‘হিন্দু ফিমেল স্কুল’ নাম নিয়ে রেজিস্ট্রিকৃত হয়। বিদ্যাসাগর মশাই বিদ্যালয়ের সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

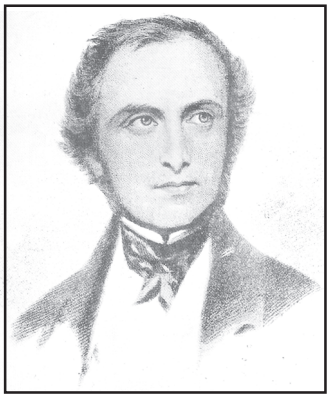

বেথুন সাহেব

এ-প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ্য। ‘হিন্দু ফিমেল স্কুল’ স্থাপনার কিছু আগে ১৮২০ সালে বাগবাজার অঞ্চলের রাজা রাধাকান্ত দেব বালিকাদের শিক্ষার জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ‘মহিলা শিক্ষাসমিতি’ স্থাপন করে, ‘স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক’ প্রবন্ধ রচনা করে, সেটি কয়েকশো কপি ছাপিয়ে শিক্ষিত সাধারণ মানুষদের মধ্যে বিলি করেন। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্টে তিনি লিখেছেন : ‘‘মহিলা শিক্ষাসমিতি দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত বালিকাদিগকে পরীক্ষা করা গেল, তাহাদের পড়া ও বানান অতিশয় সন্তোষজনক।’’

ওই বছর রাজা রাধাকান্ত দেব নিজেই চল্লিশ জন বালিকার শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। ছোট ছোট চারটি বিদ্যালয় শোভাবাজার, জানবাজার, শ্যামবাজার ও এন্টালিতে স্থাপন করেন। তিনি অঢেল অর্থ ব্যয় করলেও উচ্চবিত্ত মানুষেরা এগিয়ে না আসায় অর্থাভাবে খরচ চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে ১৮২৪ সালের মধ্যে একে একে স্কুলগুলি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু রাধাকান্ত এবং অনেক বিদ্বান ও গুণী মানুষ অন্তরে গভীর ব্যথা ও অনুতাপ বোধ করতে থাকেন। তার ফলে পঁচিশ বছর পরে যখন বেথুন সাহেব ‘হিন্দু ফিমেল স্কুলের’ জন্য আহ্বান জানালেন তখন তাঁরা তাতে সাড়া দিতে আগ্রহী হলেন।

১৮৫১ সালে বেথুন সাহেব ‘জনাই’ গ্রামে একটি স্কুল পরিদর্শনে যান। সে-সময়ে পথে বহুক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজে তাঁর নিউমোনিয়া ও জ্বর হয়। অল্পকাল রোগভোগের পর হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। প্রাণের সুহৃদ এই অবলাবান্ধব সাহেবটির প্রয়াণে বিদ্যাসাগর কেঁদে আকুল হন। কিন্তু কোনও কাজ শুরু করে, মাঝপথে থামবার পাত্র তো তিনি ছিলেন না! তাই হিন্দু ফিমেল স্কুলের উন্নতিকল্পে সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন তিনি। বেথুনের নামকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়ার জন্য স্কুলটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হল ‘বেথুন বালিকা বিদ্যালয়’।

বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় সাড়া দিয়ে তৎকালীন গভর্নর জেনারেলের পত্নী লেডি ক্যানিং বিদ্যালয়টির জন্য অর্থসংস্থানের চেষ্টা করেন। ছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য গাড়ি কেনা হয়।

বিদ্যাসাগর বিভিন্ন সভায় সীতা, সাবিত্রী, গার্গী, মৈত্রেয়ীর শতমুখে প্রশংসা করতেন এবং শাস্ত্রবচনের উল্লেখ করে সমাজে সর্বস্তরের মানুষের মনে স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে আগ্রহ সৃষ্টিতে যত্নশীল ছিলেন। বেথুন সাহেবের প্রয়াণের পর তাঁর প্রচেষ্টা আরও বৃদ্ধি পেল। ক্রমে স্বামী বিবেকানন্দের দুই বোন, কেশবচন্দ্র সেনের কন্যারা, ঠাকুরবাড়ির স্বর্ণকুমারী দেবী, পরে তাঁর কন্যা সরলা দেবী চৌধুরাণী—সকলেই বেথুন স্কুলের ছাত্রী হয়েছিলেন। প্রথম মহিলা চিকিৎসক কাদম্বিনী গাঙ্গুলীও এই স্কুলের ছাত্রী।

লেডি ক্যানিঙের মতো আর এক সহৃদয়া মিস মেরি কার্পেন্টার বিদ্যাসাগরের সুখ্যাতি শুনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহী হন। তিনি কেশবচন্দ্র সেনেরও সুহৃদ ছিলেন। এই কার্পেন্টারের কাছেই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে

শিক্ষিতা করে তোলার আবেদন জানালে, তিনি বিশেষ প্রীত হয়ে জ্ঞানদা- নন্দিনীকে পত্র লেখেন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মিস কার্পেন্টার বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য বিদ্যাসাগরকে সবদিক থেকে সহায়তা করতে শুরু করেন। বিদ্যাসাগর এবার গ্রামাঞ্চলেও বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে মেদিনীপুর, হুগলি, বর্ধমান, নদীয়া জেলার গ্রামে গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা নিলেন। স্কুল ইন্সপেক্টরের চাকুরি করায় তাঁকে প্রায়ই গ্রামে গ্রামে স্কুল পরিদর্শনে যেতে হত। স্কুলগুলির অর্থকষ্ট তাঁকে পীড়া দিত। তিনি নিজের অর্থব্যয়ে বালিকাদের জন্য বই, কাগজ, শ্লেট, পেন্সিল কিনে দিতে লাগলেন, কিন্তু শিক্ষকদের বেতন বাবদ যে আরও অর্থ প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করা বেশ মুশকিল হয়ে দাঁড়াল। মিস কার্পেন্টারের পরামর্শে বিদ্যাসাগর তৎকালীন শিক্ষা অধিকর্তার সহায়তা প্রার্থনা করে একটি দরখাস্ত পেশ করেন। শিক্ষা অধিকর্তা ইয়ং সাহেব প্রথমে খুবই আশ্বাস দিলেও, পরে তা অস্বীকার করেন। বিদ্যাসাগরের মন ভেঙে যায়। ইয়ং সাহেবের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হওয়ায় তিনি তাঁর পাঁচশত টাকার চাকুরিটি ছেড়ে দেন। ভগ্নমনে তাঁর শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত ও ভগ্নস্বাস্থ্য বিদ্যাসাগর সাঁওতাল পরগণার কার্মাটাড়ে চলে যান।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

কিন্তু বঙ্গে শিক্ষার বিজয়রথ থেমে থাকেনি। এর কিছুদিন পরে ১৮৯৩ সালের ১৯ এপ্রিল কলকাতার চোরবাগানে মাতাজী গঙ্গাবাঈ মেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করলেন, নাম দিলেন 'মহাকালী পাঠশালা'। প্রথমে বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা ছিল ত্রিশ। পরের চারবছরের মধ্যে তা বেড়ে দাঁড়াল একশো আশি। ১৮৯৭ সালে স্বামীজী শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে নিয়ে এই বিদ্যালয়টি পরিদর্শনে গিয়ে সন্তুষ্ট হন। এখানে পড়াশোনার পাশাপাশি বালিকাদের হিন্দুধর্মের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি, পূজাপাঠ সম্পর্কেও শিক্ষাদান করা হত।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম থেকেই ভারতে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। শিক্ষার অভাবেই আমাদের মেয়েদের এত দুর্দশা ও কষ্ট। নারীজাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তার যে কতটা প্রয়োজনীয় তা তিনি বারংবার বিভিন্ন চিঠিপত্রে, বক্তৃতায়, আলাপচারিতায় প্রকাশ করতেন। তাঁর শিষ্যা মিস মার্গারেট নোবল অর্থাৎ ভগিনী নিবেদিতা ভারতে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে নিজেকে সমর্পিত করলেন। নিবেদিতার পরিকল্পিত স্কুলে ছাত্রী সংগ্রহের জন্য স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীকে উৎসাহিত করেন। অবশেষে ১৮৯৮ সালের ১৩ নভেম্বর ১৬নং বোসপাড়া লেনের একটি ভাড়াবাড়িতে 'রামকৃষ্ণ স্কুল ফর গার্লস' স্থাপিত হয়। দিনটি ছিল কালীপূজার দিন। স্বয়ং শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী বিদ্যালয়ে শুভ পদার্পণ করেন এবং ছাত্রীদের আশীর্বাদ করেন। প্রাণে নব উদ্দীপনা নিয়ে ভগিনী নিবেদিতাও পরম যত্নে ছাত্রীদের সঙ্গে কখনও খেলা করে, কখনও গল্প বলে, কখনও তাদের হাতের কাজের প্রশংসা করে পাঠে উৎসাহিত করে চলেন। বাড়ি বাড়ি ঘুরে অভিভাবকদের সচেতন করে তোলেন। নারীদের স্বয়ম্ভর করার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের একটি বিভাগ চালু হয় বয়স্কা

অনূঢ়া কন্যা ও বালবিধবাদের জন্য। সেটিকে বলা হত 'পুরস্ত্রী-বিভাগ'। এভাবে নারী শিক্ষা বিস্তারে আর-একটি মাইলস্টোন পোঁতা হল। এই স্কুল আজ 'নিবেদিতা স্কুল' নামে বিখ্যাত। নারীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে ভগিনী নিবেদিতার অবদান অবিস্মরণীয়।

ক্রমে আরও কতকগুলি বালিকা বিদ্যালয় খাস কলকাতার বুকে স্থাপিত হয়ে গেল। লেডি অবলা বসুর উদ্যোগে 'বসু বিজ্ঞান মন্দিরে'র উলটোদিকে স্থাপিত হল ব্রাহ্ম গার্লস স্কুল। শাখাওয়াৎ হোসেনের নামে বেগম রোকেয়া গড়ে তুললেন শাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল। স্থাপিত হল গোখেল মেমোরিয়াল স্কুল। এইসব সমষ্টিগত উদ্যোগের পাশাপাশি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় অন্তঃপুরে পর্দার আড়ালেও মেয়েদের শিক্ষালাভের ব্যবস্থা কোথাও কোথাও চলতেই থাকল। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, কোচবিহারের রাজবাড়ি, রাজা রাধাকান্ত দেবের বাড়ি, মুর্শিদাবাদে রানি ভবানীর অন্তঃপুর। তবে সেসময়ের অধিকাংশ মানুষ বাইরের দুনিয়ায় নারীদের পুরুষের সমান সমান হয়ে স্কুলে যাওয়াকে ঘোরতর অনাচার হিসাবে দেখতেন। বিশেষত পল্লিগ্রামে এ নিয়ে দুশ্চিন্তা ও রঙ্গতামাশা, অভিশাপ বর্ষণ চলতেই থাকত। প্রথম আত্মজীবনী লেখিকা রাসসুন্দরী দেবী তাঁর 'আমার জীবনকথা' বইখানি লেখা শুরু করেন ১৮৬৮ সালে, শেষ করেন ১৮৭৫ সালে। তখন তাঁর বয়স ঊনষাট বছর। তিনি বারোটি সন্তানের জননী ছিলেন। সংসারের সব কাজ শেষ করে, বড় ছেলে বিপিনের তালপাতায় লেখা বর্ণগুলি তিনি রান্নাঘরের মাটির উপর কাঠকয়লা দিয়ে লিখে লিখে 'মক্‌সো' করতেন। পুত্রের সহায়তায় নিজের অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি প্রথম 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থটি পড়তে শেখেন। তিনি লিখেছেন : ''সকলেই আলোচনা করিত বিরূপ কথা।'' তিনি আরও লিখেছেন, সবাই বলত : ''বুঝি বা কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিতে পাই। এখন বুঝি মেয়েছেলেতেও পুরুষের কর্ম করিবেক।'' এছাড়াও অনেকে রব তুলেছিল : ''মেয়েরা পড়াশুনা শিখিলে ব্যভিচার সংঘটনের সম্ভাবনা আছে। বালিকাগণ বিদ্যাশিক্ষা করিলে অচিরাৎ বিধবা হইবেক।'' শ্রীশ্রীমা সারদাও ভাসুরঝি লক্ষ্মীমণির সঙ্গে বর্ণপরিচয় পড়তে শুরু করলে ভাগ্নে বই কেড়ে নিয়ে বলেছিলেন : ''শেষে কি নাটক নভেল পড়বে?'' তবু তাঁরা পড়তে ভালই শিখেছিলেন।

এতসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নারীদের শিক্ষার জগতে বিচরণ ও অগ্রগতি বন্ধ করা যায়নি। তাই আজ আমরা দেখি শিক্ষকতা, গবেষণা, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং সবক্ষেত্রেই মেয়েরা দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করে চলেছেন। এ যে কত সংগ্রাম, কত দুঃখ, কত অপমানের পথ পেরিয়ে তবেই সম্ভব হয়েছে— ইতিহাসের পাতায় পাতায় সেই কথা লেখা আছে। তাই একবিংশ শতকে আমরা যারা শিক্ষিতা বলে গর্ববোধ করি, শিক্ষার আলোটিকে আরও ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব তাদের ওপরে বর্তায়। এখনও কত কাজ যে বাকি, একথা মনে না রাখলে পূর্ব সংগ্রামীদের প্রতি যথার্থ সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানো অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

সহায়ক গ্রন্থ

১। প্রকাশক সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর* (বঙ্গীয় স্বাক্ষরতা প্রসার সমিতি, কলকাতা) প্রবন্ধ *স্ত্রীশিক্ষায় বিদ্যাসাগর*, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২। চিত্রা দেব, *অন্তঃপুরের আত্মকথা* (জীবনী : রাসসুন্দরী দেবী)